কেমোথেরাপী

চিকিৎসা

50

1969
2019

CPAA

CANCER PATIENT'S AID ASSOCIATION

Total Management of Cancer

www.cancer.org.in

কেমোথেরাপী

সূচী

সিপিএএ সম্পর্কে কয়েকটি কথা - 03

১। কেমোথেরাপী চিকিৎসা - 03

২। কেমোথেরাপী দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি 04

ক) মৌখিকভাবে (Oral) 04

খ) পেশীর মধ্যে দিয়ে (Intramuscular) 04

গ) শিরার মধ্যে দিয়ে (Intravenous - IV) 04

ঘ) মেরুদন্ডর মধ্যে দিয়ে (Intrathecal) 04

ঙ) ধমনীর মধ্যে দিয়ে 04

চ) শারিরীক গহ্বরের (পেট বা বুকের গহ্বর) মধ্যে দিয়ে (Intracavitary) 04

৩। কেমোথেরাপী দেওয়ার মাত্রা বা ডোজ্ (Dosage) 05

৪। চিকিৎসার নির্ঘন্ট বা সেডুল (Schedule) 05

৫। কিছু সম্ভাব্য প্রশ্ন এবং উত্তর - 06

৬। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা সাউড এফেকট্ (side effect) কেন হয় 06

৭। সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা সাইড এফেকট্ (side effect) এবং তাদের প্রতিহত করবার উপায় 06

ক) গা গুলানো (nausea) এবং বমি বমি ভাব 07

খ) চুল পড়া 07

গ) ক্লান্তি এবং অবসন্নতা (fatigue) 07

ঘ) রোগ সংক্রমণ (infection) 07

ঙ) দাস্ত বা পেটখারাপ (diarrhta) 08

চ) কোষ্ঠকাঠিন্যতা 08

ছ) থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া (thrombocytopenia)
মানে প্ল্যাটিলেট্ (platelet) কম হয়ে যাওয়া 08

জ) স্মৃতিশক্তি এবং চিন্তাশক্তির সমস্যা - কেমব্রেন (chemo-brain) 09

ঝ) 'পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি' (Peripheral Neuropathy)
-সাময়ীক হাত পা অবশ হয়ে যাওয়া, ঝিঁঝি ধরা 09

ঞ) যৌন ইচ্ছা অসুবিধা এবং গর্ভধারণ অক্ষমতার উপর প্রভাব 10

ট) আবেগের (emotion) উপর প্রভাব 10

৮। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে কি ধরণের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার 10

সিপিএএ (ক্যান্সার পেশেনট্স্ এড্এ্যাসোসিয়েশন)

সিপিএএ একটি বেসরকারী তালিকাভুক্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা শুধুমাত্র গরীব রোগীদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল। এই ৪৪ বছরে এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য আরো বিস্তারিত হয়েছে, যেমন ক্যান্সার হবার মূল কারণ এবং ভারতবর্ষে অভাবিত রোগ বৃদ্ধির অনুসন্ধান, ক্যান্সার সম্পর্কিত ভুল ধারনা, অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কাব (যা রোগটিকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে।) এককথায় বলা যায় সিপিএএ ডাক্তার এবং হাসপাতালের পূরক হিসেবে কাজ করে। এই প্রতিষ্ঠানের দর্শন হল ''ক্যান্সারের সম্পূর্ণ নির্বাহ'' (Total management of Cancer) যেমন - সচেতনতা প্রচার, প্রথমাবস্থায় অন্বেক্ষণ, (early detection), ইন্সিওরেন্স্ বা ক্যান্সার বীমা, চিকিৎসা চলাকালীন সাহায্য, পথপ্রদর্শন, সহমর্ম্মিতা এবং অবশেষে পূনর্বাসন।

সচেতনতা - তামাকসেবন, বাল্যবিবাহ, অগণিত গর্ভাবস্থা, জাতীয় সামাজিক কিছু প্রথা ৭০% ক্যান্সার রোগ আক্রান্ত হবার জন্য দায়ী।

প্রথমাবস্থায় অন্বেক্ষণ - রোগের প্রথমাবস্থায় ধরা গেলে চিকিৎসা সুবিধাজনক হয় এবং আরোগ্য বিধানের সম্ভাবনাও বেশী থাকে - এই তথ্যের প্রচার -

রেগী এবং পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান - ক্যান্সার রোগী এবং পরিবারকে সম্পূর্ণ মানসীক এবং সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য প্রদান। এছাড়াও সিপিএএ নেশাবৃত্তি, স্বল্পদামে ক্যান্সার ঔষুধ প্রপ্তি এইসব সমস্যার প্রতি সক্রিয়ভাবে পক্ষ সমর্থন (Advocacy), স্বেচ্ছাসেবকদের অনুশীলন (Voluntees training)- এইসব ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজ করে।
মুম্বাইতে স্বল্পদানের উপর নির্ভরশীল একটি ছোট সংস্থা হিসেবে শুরু হবার পর আজ সিপিএএ শুধুমাত্র শক্ত কাঠামোতে দাঁড়ানোর উপযুক্তই নয়, দিল্লী এবং পূণাতে দুটি শাখাও পরিচালনা করে।
সিপিএএ-র সম্পূর্ণ আয় বেসরকারী এবং ব্যক্তিগত দানের ওপর নির্ভরশীল।

১। কেমোথেরাপী চিকিৎসা -

ক্যান্সারের লক্ষণ হল শরীরের মধ্যে সীমাবিহীন অজাচিত কোষ বৃদ্ধি (uncontrolled growth of cells) যা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এই রোগে কোষ (cell) গুলি কোন নিয়ম ছাড়া একটি থেকে আরেকটি বেড়ে গিয়ে শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কেমোথেরাপী চিকিৎসায় ক্যান্সার বিরুদ্ধ (cytotoxic) ঔষুধ প্রয়োগ করে ক্যান্সারের কোষ (cell) গুলিকে নষ্ট করা হয়। এই চিকিৎসায় ক্যান্সার কোষ গুলির বৃদ্ধির প্রবণতাকে রোধ করা হয় বা কম করা হয়, কারণ এই কোষগুলি তীব্র বেগে একটা থেকে আরেকটা ক্যান্সারগ্রস্ত অঙ্গে ছড়িয়ে যায়। ২০০রও অধিক কেমোথেরাপী ঔষুধ বিভিন্ন সংমিশ্রণে এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়।
মেডিকেল অঙ্কোলজিষ্ট (medical oncologist) রোগির স্বাস্থ্য এবং ক্যান্সারের প্রকার অনুযায়ী ঔষধের প্রকার, সংমিশ্রণ, চিকিৎসা সময়ের হার নির্ধারণ করেন। কেমোথেরাপী চিকিৎসায় 'কেমিকাল' বা রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় না।
যেহেতু কেমোথেরাপী কোষ বৃদ্ধির প্রবণতাকে রোধ করে, যে সমস্ত টিউমারের কোষবৃদ্ধি অত্যন্ত তীব্র, যেমন 'এ্যকিউট্ লিউকেমিয়া'' (acute leukemia), উদ্যমশীল লিম্ফোমা (Aggressive Lymphomas) ''হজ্কিনস্ লিম্ফোমা'' (Hodgkin's Lymphoma), এই সব ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা বেশী কার্যকরী হয়। কিন্তু যে সমস্ত ম্যালিগ্নেন্সিতে (malignancies) বা ক্যানসারে কোষবৃদ্ধির হার, অপেক্ষাকৃত কম, যেমন - 'ইন্ডোলেন্ট লিম্ফোমা' (Indolent Lymphoma) সে সব ক্ষেত্রে কেমোথেরাপীর কার্যকারিতা পরিমিত।
কেমোথেরাপীর কার্যকারিতা নির্ধারিত হয় ক্যান্সারের প্রকার এবং কতটা পরিণত (advanced) তার ওপর যেমন -

- **আরোগ্য বিধান** (cure) (রোগের প্রথম পর্যায়) - যখন কেমোথেরাপী সমস্ত ক্যান্সার কোষগুলিকে নষ্ট করে দেয়, ডাক্তার পরীক্ষা করেও এই কোষগুলোর অস্তিত্ব দেখতে পান না; তখন আবার কোষবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকেনা।

- **দমন করা** (control) (রোগের পরিণত পর্যায়) - যখন কেমোথেরাপী কোষবৃদ্ধির হার কম করে, নষ্ট করে, এবং কোষগুলির অন্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়া রোধ করে।

- **উপসর্গ দমন** (ease symptoms) - উপশমকারী বা প্যালেয়েটিভ্ (Palliative) চিকিৎসা - এই পর্যায় কেমোথেরাপীর লক্ষ্য হল উপসর্গ দমন, কারণ এই পর্যায় আরোগ্য নিধান সম্ভব নয়।

কিছু ধরণের ক্যান্সারের চিকিৎসা হল শুধুমাত্র কেমোথেরাপী (যেমন লিউকোমিয়া বা লিম্‌ফোমা) কিন্তু বেশীরভাগ সময় কেমোথেরাপী ক্যান্সারের অন্যান্য চিকিৎসা প্রণালী যেমন রেডিয়েশন, অস্ত্রপচার (surgery) বা বায়োলজিকাল (biological) থেরাপীর সমন্বয়ে ব্যবহার করা হয়।

কেমোথেরাপী অনেকসময় সমন্বয় পদ্ধতিতে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরণের ওষুধ একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়। এই বিভিন্ন ওষুধের কার্যকারিতা এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (side effect) আলাদা হয়। কোন কোন সময় শরীরে এক একটা ওষুধের কার্যকারিতা কম হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এই সংযুক্ত প্রক্রিয়ার কেমোথেরাপী এই সম্ভাবনাকে কম করে দেয়। কেমোথেরাপীর লক্ষ্য রোগীর এবং রোগের অবস্থা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, যেমন -

১) **নিও এ্যাড্‌জুভেন্ট কেমোথেরাপী** (neo adjuvant chemotherapy) (অস্ত্রপচার বা অপারেশনের আগে) এই পদ্ধতি পরিকল্পনা করা হয় টিউমারের আকার ছোট করবার জন্য যাতে পরবর্ত্তী চিকিৎসা (surgery or Radiotherapy - সার্জারি বা রেডিওথেরাপী) কম বিনাশকারী হয় এবং সাফল্যপ্রাপ্ত হয়। এই পদ্ধতিতে শরীরের অঙ্গ সংরক্ষণেও সাহায্য করে (যেমন স্তন সংরক্ষণ বা Breast Conservation)

২) **এ্যাড্‌জুভেন্ট কেমোথেরাপী** (Adjuvant Chemotherapy - Post Operative Treatment) (অপারেশান হয়ে যাবার পরে) অপারেশনের পরে যদি শরীরে কম মাত্রাতেও ক্যান্সার কোষ থেকে যায় তাহলেও রোগের পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি থাকে। এই সম্ভাবনাকে রোধ করবার জন্য কেমোথেরাপী দেওয়া হয়। এছাড়া এই কেমোথেরাপী শরীরের অন্যান্য অংশে যদি ক্যান্সার কোষ ছড়াতে শুরু করে (metastasis) সেই কোষ বা সেলগুলিকেও নষ্ট করে দেয়। এইসব ক্ষেত্রে কোষবৃদ্ধির প্রবণতা তীব্র থাকায়, কেমোথেরাপীর কার্যকারিতাও বেশী হয়।

৩) **প্যালিয়েটিভ্‌ কেমোথেরাপী** (Palliative Chemotherapy) - এই পর্যায়ের কেমোথেরাপীর লক্ষ্য উপসর্গ দমন করে, আরোগ্য বিধান নয়। তবে কেমোথেরাপী টিউমারের আকার কম করে, রোগীর কষ্ট কম করে, জীবনসীমা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এই পর্যায়ের কেমোথেরাপীতে টক্সিক্‌ (toxic) জাতীয় উগ্র ওষুধ ব্যাবহার করা হয়।

২ । কেমোথেরাপী কিভাবে দেওয়া হয় ?

ক্যানসারবিরুদ্ধ (anticancer) ওষুধগুলি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রোগীর শরীরে দেওয়া হয় -

ক) **মৌখিকভাবে (oral)** - এই প্রক্রিয়ায় ঔষুধ অন্ত্রের আভ্যন্তরীণ আবরণের মধ্যে দিয়ে রক্তধমনীতে প্রবেশ করে। রোগীকে ট্যাবলেট দেওয়া হয় বিশেষ নির্দেশের সঙ্গে (যেমন খাবারের সঙ্গে ট্যাবলেট্‌গুলি খেতে হবে না আগে বা খাবারের পরে)। নির্ধারিত সময় যদি এই ওষুধ না খাওয়া হয় তাহলে ডাক্তারকে জানিয়ে তাঁর পরামর্শ নেওয়া অবশ্য দরকার।

খ) **মাংসপেশীর (Intramuscular) মধ্যে দিয়ে** - এই পদ্ধতিতে মাংসপেশীর মধ্যে ইন্‌জেক্‌শান দিয়ে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়।

গ) **শিরার মধ্যে দিয়ে (Intravenous -IV)** - সাধারণভাবে সব থেকে বেশী প্রচলিত এই পদ্ধতিতে শিরার মধ্যে দিয়ে ওষুধ প্রবেশ করানো হয়। সুতরাং খুব কম সময়ের মধ্যে ওষুধ রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। যে সব কেমোথেরাপীর ওষুধ সুস্থ পেশী (healthy tissue) গুলির পক্ষে হানিকারক হয় সেই ওষুধগুলি আইভি (iv)-র সাহায্যে জলীয় পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়। এইভাবে ওই ওষুধগুলির রাসায়নিক ভাগের ক্ষমতা কম হয়ে যায় এবং ক্ষতির পরিমাণ কম হয়। সাধারণত **ক্যাথিটা (catheter)** বা বিশেষ নল। **পোর্ট (port)** বা **পাম্প (pump)** এই পদ্ধতিতে ব্যাবহার করা হয়।

a. **ক্যাথিটা (Catheter)** - ক্যাথিটা হল একটা নাম নমনীয় সরু নলী (tube)। শস্ত্রচিকিৎসক (surgeon) এই ক্যথিটার এক প্রান্ত একটি শিরার সঙ্গে যুক্ত করেন (সাধারণত বুকের আশেপাশে) এবং অন্য প্রান্ত শরীরের বাইরে থাকে। সাধারণত এইভাবেই ক্যথিটাটিকে রাখা হয়

যতক্ষণ কেমোথেরাপি চলে। কেমোথেরাপী ছাড়াও কোন কোন সময় ক্যথিটা ব্যাবহার করা হয় অন্যান্য ওষুধের জন্য বা রক্ত নেবার জন্য। ক্যথিটা থাকাকালীন রোগসংক্রমণ বা infection-এর সম্ভাবনা থাকে, তাই সাবধানতা নেওয়া অত্যন্ত জরুরী।

b. **পোর্ট (Port)** - পোর্ট হল একটি প্লাস্টিকের বা ধাতুর গোলাকার চাকতি। এই চাকতিটিকে চামড়ার নীচে রোপন করা হয়। একটি ক্যথিটা এই পোর্টের সঙ্গে একটি বিশেষ শিরা যুক্ত করে, সাধারণত রোগীর বুকের কাছে। এই পোর্টের মধ্যে ছুঁচ ঢুকিয়ে কেমোথেরাপী দেওয়া হয় বা রক্তের নমুনা নেওয়া হয়। এই ছুঁচটি রেখে দেওয়া হয় যতক্ষণ কেমোথেরাপী চলে। অনেক সময় একদিনেরও বেশী। এই ক্ষেত্রেও রোগ সংক্রমণ বা infection যাতে না হয় তার সাবধানতা নেওয়া দরকার।

c. **পাম্প (Pump)** - পাম্প সাধারণত পোর্টের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই পাম্প নিয়ন্ত্রন করে কতটা এবং কিরকম গতিতে কেমোথেরাপীর ওষুধ ক্যথিটা বা পোর্টের মধ্যে যাবে। আভ্যন্তরীণ পাম্পের ক্ষেত্রে পাম্প চামড়ার নীচে রোপন করা হয়। আবার পাম্প বাইরেও থাকে। এই ক্ষেত্রে রোগীকে পাম্পটিকে নিয়ে চলতে হয়।

ঘ) **মেরুদন্ডের মধ্য দিয়ে - ইন্ট্রাথেকাল (Intrathecal)** - এই পদ্ধতিতে মেরুদন্ডের মধ্যে ইন্‌জেক্‌শান দিয়ে শরীরের মধ্যে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়।

ঙ) **ধমনীর মধ্যে দিয়ে (Intra Arterial)** - এই পদ্ধতিতে সরাসরি ধমনীতে ইন্‌জেকশান্ দিয়ে শীররের কোন বিশেষ অংশে বা অঙ্গের চিকিৎসা হয় (যেমন লিভার, হাত বা পা)। যেহেতু ওষুধ সোজা বিশেষ অঙ্গে সরাসরি পৌঁছায় তাই শরীরের অন্যান্য অংশ কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

চ) **শরীরের গহ্বরের মধ্যে দিয়ে - ইন্ট্রাক্যাভেটারি(Intracavitary)** - এই প্রক্রিয়ায় ওষুধ ক্যাথিটারের সাহায্যে বুক বা তলপেটের গহ্বরের মধ্যে দিয়ে সোজাসুজি রোগগ্রস্ত অংশে পৌঁছায়।

৩। কেমোথেরাপী দেওয়ার মাত্রা বা ডোজ্ (Dosage) -

কেমোথেরাপীর মাত্রা নির্ধারণ করা একটি কঠিন কাজ। মাত্রা যদি খুব কম করা হয় তাহলে কার্যকারিতা একেবারেই কম হবে। আবার মাত্রা খুব বেশী হলে অত্যধিক বিষক্রিয়ার (Toxicity) ফলে রোগীর শরীর বেহাল হয়ে যাবে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানগত গবেষণা এবং তথ্য অনুসরণ করে একটি মাত্রা পরিকল্পনা (dosing scheme) বা প্রোটকল (protocal) তৈরী করা হয় যেটা কম এবং বেশী মাত্রার সমতা রাখে।

সাধারণত রোগীর শরীরের আয়তন পরিমাণ (body volume) এবং ঘনফলের (volume) সঙ্গে শরীরে রক্তের ঘনফল বা পরিমানের পারস্পরিক সম্বন্ধের ওপর নির্ভর করে ডাক্তার (onco physician) এই মাত্রা নির্ধারণ করেন। যদি রোগীর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা সাইড্ এফেক্ট অত্যন্ত বেশী মাত্রায় হয় তখন চিকিৎসা কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখা হয় বা মাত্রা কম করা হয়। মাত্রা কম করার ক্ষেত্রে ডাক্তার শরীরের অবস্থা এবং কেমোথেরাপীর কার্যকারিতার এই দুটোর পরিমাণ সামনে রেখে সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করেন। কেমোথেরাপীর মাত্রা এবং কতদিনের ব্যাবধানে দেওয়া হবে নির্ভর করবে কি ধরণের ক্যান্সার, কোন ওষুধ ব্যাবহার করা হবে এবং রোগীর শরীরে কি রকম প্রভাব হবে এই সমস্ত তথ্যর বিচার করে। সুতরাং এই চিকিৎসার ধারাবাহিকতা বা (frequency) বিভিন্ন প্রকার হয়, যেমন প্রতিদিন, সাপ্তাহিক, তিন সপ্তাহের ব্যাবধানে বা কোন কোন সময় অনিয়মিত ভাবেও দেওয়া হয়। যাতে শরীরে এই মাঝখানের সময় সাস্থকর কোষ (cell) জন্ম নিতে পারে এবং শরীরে ক্ষমতা ফিরে আসতে পারে। কেমোথেরাপীর মাত্রা, ধারাবাহিকতা এবং দৈর্ঘ্য প্রতিটি রোগীর আলাদা হয় রোগের মাত্রা অনুযায়ী। ক্যান্সার একটি জটিল রোগ। যেমন একই ধরণের ক্যান্সার বিভিন্ন রোগীকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং নির্দিষ্ট ওষুধের প্রণালী প্রতিটি রোগীর অবস্থা অনুযায়ী পরিকল্পনা করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে ''ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসা পদ্ধতি'' (personalized treatment) বলা হয়।

৪। **কেমোথেরাপী চিকিৎসার নির্ঘন্ট বা সেডুল (schedule)** - কেমোথেরাপীর ধারাবাহিকতা নির্ভর করে চিকিৎসার লক্ষ্য নির্দিষ্ট ওষুধ কিভাবে কাজ করছে এবং শরীরের ওপর এই ওষুধগুলোর কিরকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, এইসব তথ্যর ওপর বিচার করে। বিভিন্ন ওষুধ বিভিন্নভাবে কোষের ধারাবাহিকতার (cell cycle) ওপর কাজ করে (কোষ বৃদ্ধির এবং বিভাজনের হার)। নির্ঘন্ট বা সেডুলের (schedule) প্রধান লক্ষ্য হল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম করে (যাতে শারিরীক কারণে চিকিৎসার ধারাবাহিকতাতে বিঘ্ন না হয়) যত বেশী মাত্রার ব্যাবধানে যত বেশী ওষুধ ব্যাবহার করা যায়।

ডাক্তার নির্ধারিত চিকিৎসা সম্পূর্ণ করা অত্যন্ত জরুরী। তথ্যানুযায়ী চিকিৎসার ফল আশাজনক হয় যদি চিকিৎসা সম্পূর্ণ করা যায়। কোন কোন সময় কোন বিশেষ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার (side effect) জন্য ডাক্তার কেমোথেরাপীর মাত্রা অনেকসময় কম করে দেন। তথ্যানুযায়ী, পরিকল্পনা অনুযায়ী চিকিৎসা সম্পূর্ণ করলে চিকিৎসার ফলাফল আশাজনক হয়। কেমোথেরাপী শুরু হবার আগে ডাক্তারের সঙ্গে সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং কিভাবে তার নির্বাহ করার উপায় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরী।

ডাক্তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক ওষুধ যে প্রণালীতে ব্যাবহার (personalised drug regimen) করবেন সেটা নির্ভর করে -

- কি ধরণের ক্যান্সার
- অসুখটি কোন পর্যায় রয়েছে (stage) তার আকার এবং কতটা শরীরে ছড়িয়েছে
- রাগীর সাস্থ্য এবং বয়স (রোগীর অন্যান্য কোন রোগ আছে কিনা, যেমন হার্টের অসুখ)
- চিকিৎসার লক্ষ্য

চিকিৎসার ব্যাঘাত - কোন একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার (side effect) প্রভাব যদি ভয়াবহ হয় রোগীর শরীরে তাহলে ডাক্তার ওষুধের মাত্রা কম করে দেন বা ভবিষ্যৎ চিকিৎসার পরিকল্পনা বদল করে দেন। কিছু বিশেষ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যা অনেকসময় প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়ায় তা হল রক্তে শ্বেত বা লাল কণিকার সংখ্যা (blood count) কম হয়ে যাওয়া, যার ফলে নিউট্রোপেনিয়া (Neutropenia) হয়। রক্তশূন্যতা, যার ফলে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া (Thrombocytopenia) হতে পারে অথবা খুব বেশী গা বমিভাব এবং বারবার বমি যা শরীরকে খুব দুর্বল করে দেয়।

চিকিৎসা কোথায় করা যায় - কেমোথেরাপী চলাকালীন রোগী কোথায় থাকতে পারে সেটা নির্ভর করে কি ধরণের ওষুধ ব্যাবহার করা হচ্ছে, এবং কি প্রক্রিয়ায় দেওয়া হচ্ছে তার উপর। ট্যাবলেটের মধ্যে দিয়ে যখন কেমোথেরাপী চলে, মৌখিকভাবে, তখন রোগী বাড়ীতেই থাকতে পারে। অন্যান্য প্রক্রিয়ার সাহায্য নিলে কোন 'ডে কেয়ার' (Daycare) প্রতিষ্ঠানে বা হাসপাতালের 'ডে কেয়ারে' এই চিকিৎসা হয়। যেখানে রোগী চিকিৎসা শেষ হবার পরে বাড়ী চলে যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ের (cycle) কেমোথেরাপী যখন শুরু হয় তখন অনেকসময় রোগীকে অল্প কয়েকদিনের জন্য হাসপাতালে ভর্ত্তি থাকতে হয় যাতে ডাক্তার নজর রাখতে পারেন।

৫। **কিছু সম্ভাব্য প্রশ্ন এবং উত্তর -**

১) **কেমোথেরাপী দেওয়ার সময় কি ব্যাথা লাগে ?**

ধমনীর মধ্যে দিয়ে (IV) যখন ওষুধ দেওয়া হয় তখন প্রথম ছুঁচ ফোটানের সময় অল্প লাগে, পরে কিছু হয় না। তবে যদি ওষুধ যাবার সময় ব্যাথা লাগে, ঠান্ডা হয়ে যাওয়া বা জ্বলার মত অনুভূতি হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বা নার্সকে বলা উচিৎ কারণ এই ধরণের অনুভূতি হওয়া উচিত নয়।

২) **কেমোথেরাপী চলাকালীন অন্যান্য ওষুধ খাওয়া যেতে পারে ?**

কিছু কিছু ওষুধ কেমোথেরাপীর ওষুধের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং চিকিৎসা শুরু হবার আগে রোজকার ওষুধের নাম, কতবার নেওয়া হয় সমস্ত তথ্য কোমোথেরাপীর ডাক্তারকে দেখানো উচিৎ। পেটখারাপ, সর্দ্দিকাশি জ্বরের ওষুধ সবকিছুই ডাক্তারকে দেখানো দরকার।

৩) **কেমোথেরাপী চলাকালীন কাজ (চাকরি) করা উচিৎ?**

রুগীর কাজ কি ধরনের, কতটা সময় থাকতে হবে কাজে, কি নির্ঘন্ট বা সেডুল এবং শারিরীক অবস্থা সবকিছুর ওপর এটা নির্ভর করে। তবে অনেকেই কেমোথেরাপী চলাকালীন কাজ করে। অফিস অনুমোদন করলে বাড়ী থেকে কাজ করা বা পুরো সময়ের বদলে অল্পসময় কাজ করা বা শরীর খারাপ লাগলে একদিন বিশ্রাম নিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনাও ভেবে দেখা যেতে পারে। অনেক অফিসে ক্যান্সার চিকিৎসাগত কর্মচারীদের তাদের অবস্থানুযায়ী কাজ করার অনুমোদন করার নিয়মও আছে। অফিসের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে কথা বলে নেওয়া দরকার বা হাসপাতালের ''সোশাল সার্ভিস'' বিভাগের কর্মচারীর পরামর্শও নেওয়া যেতে পারে।

৪) **কোমোথেরাপী চিকিৎসা চলাকালীন মদ্যপান করা যায়?**

অল্পমাত্রায় মাদকীয় বা এ্যালকহল (alcohal) স্নায়ু শিথিল করে হয়ত, কিন্তু কিছু কিছু ওষুধের সঙ্গে যদি নেওয়া হয় তার পরিণাম শরীরের প্রতি হানিকারক হতে পারে। ডাক্তারের অনুমতি ছাড়া মাদকদ্রব্য নেওয়া অনুচিত।

৫) **কেমোথেরাপী কাজ করছে কি না কি করে বোঝা যাবে?**

কেমোথেরাপী শুরু হবার পরে কাজ হচ্ছে কি না জানবার জন্য ডাক্তার নিয়মিত পরীক্ষা করেন (রক্ত পরীক্ষা, এক্স রে ইত্যাদি) সুতরাং ডাক্তারের কাছ থেকেই খবর পাওয়া যাবে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সঙ্গে চিকিৎসার ফলের কোন সম্পর্ক নেই। এমনও হতে পারে যে কারুর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (side effect) হলই না বা অপেক্ষাকৃত কম হল, তাহলেই মনে করা উচিত নয় যে চিকিৎসাতে উপকার হচ্ছে না।

৬) **চিকিৎসাগত রোগীর চিকিৎসার গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণ বা ক্লিনিকাল ট্রায়াল মানে কি, এই প্রক্রিয়ায় কি চিকিৎসার কোন বিশেষ সুবিধা হয়?**

চিকিৎসার পরীক্ষার (বা চিকিৎসার গবেষণা) উদ্দেশ্য নতুন ধারায় চিকিৎসার পরীক্ষা (যেমন নতুন ধরনের কেমোথেরাপী বা অন্য ধরণের চিকিৎসা বা দুটোর সমন্বয় চিকিৎসা। এই সমস্ত পদ্ধতিরই লক্ষ্য একটাই সেটা হল কি ভাবে ক্যান্সার রোগীর উন্নত মানের চিকিৎসা। ডাক্তার বা নার্স রোগীকে এই ধরণের প্রক্রিয়ার প্রস্তাব করতে পারে। রোগী নিজেই এই ধরণের প্রক্রিয়ায় ভাগ নেবার কথা প্রস্তাব করতে পারে। তবে এই প্রক্রিয়া স্বীকার করার বা প্রস্তাব করার আগে এই সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য খতিয়ে দেখা উচিৎ এবং মনে রাখা উচিৎ যে এই প্রক্রিয়া উপকারকও হতে পারে আবার হানিকারকও হতে পারে। এই নতুন চিকিৎসা প্রক্রিয়া কি ধরণের এটি আগে কারুর কি এই পদ্ধতি ব্যাবহৃত হয়েছে? আপনিই কি প্রথম এই প্রক্রিয়ায় চিকিৎসা করবেন? নতুন প্রক্রিয়া সব সময় চালু প্রক্রিয়ার মত নয়। প্রক্রিয়াটি ভালো হলেও আপনার শরীরে কিরকম ভাবে কাজ করবে?

এই প্রক্রিয়ায় রোগীর সম্মতি না থাকলে কেউ জোর করতে পারে না এই প্রক্রিয়াতে যোগদান করতে।

৬। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা সাইড এফেক্ট কেন হয়?

শরীরের অবাঞ্ছিত, বাড়ন্ত কোষগুলিকে মারবার কাজ হল কেমোথেরাপী ওষুধের। কিন্তু যেহেতু এই ওষুধ সমস্ত শরীরেই ছড়িয়ে যায় এবং সুস্থ অনুকোষগুলিও এই ওষুধের সংস্পর্শে আসে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেইজন্যই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যদিও বহুক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া যতটা ভাবা হয় তার থেকে কমই হয়। তাহলেও ক্যান্সার চিকিৎসার এই ভাগটির প্রতি একটা ভীতি দেখা যায়। ওষুধের মাত্রা, রোগীর স্বাস্থ, রোগীর মনভাব এবং ধারাবাহিকতার ওপর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম বেশী হয়।

''সুস্থ মনবল আরোগ্যলাভে সহায়তা করে''

৭। সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা সাইড্ এফেক্ট এবং তাদের প্রতিহত করবার উপায় -

গাগুলানো (Nasea), বমি, চুল পড়ে যাওয়া, ক্লান্তি, অল্পতেই ছড়ে যাওয়া এবং রক্তক্ষয়, পেটখারাপ বা কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তহীনতা এবং রোগ সংক্রমণ - হল সবথেকে প্রচলিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। কোন কোন সময় কোন

বিশেষ অঙ্গ কেমোথেরাপী ওষুধের প্রভাবে আক্রান্ত হলে অন্ত্র সম্বন্ধিয় সমস্যা, খিদে এবং ওজন কমে যাওয়া, মুখে বা মাড়িতে বা গলায় ক্ষত, শিরা বা মাসলের সমস্যা, চামড়ার রুক্ষতা, মুত্রাশয় (kidney) এবং মুত্রস্থলীতে (bladder) অস্বস্তি, যৌন সমস্যা, শরীরের প্রজনন অঙ্গের (reproductive organ) সমস্যা ইত্যাদি দেখা যায়। এটা মনে রাখা উচিৎ যে প্রত্যেকেরই এই অসুবিধাগুলি নাও হতে পারে এবং কার কতোটা বেশী কতোটা কম হবে সেটা নির্ভর করে ব্যক্তি বিশেষে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ডাক্তারের সঙ্গে সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে পরামর্শ নেওয়া দরকার। ডাক্তারের ওষুধ অনেক সমস্যাকেই সাহায্য করে। এই চিকিৎসা শেষ হওয়ার পরেই এইসব অসুবিধা চলে যায়। কারণ - শরীরের ভালো কোষগুলি সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু সুস্থ হয়ে ওঠা শরীরের শক্তি ফিরে পাওয়ার সময় প্রত্যেকের আলাদা। এটা ব্যক্তি বিশেষের স্বাস্থ্য কি ধরণের ওষুধ ব্যাবহার করা হয়েছে এবং আরো কিছু অবস্থার ওপর নির্ভর করে।

ক) গা গুলোনা (Nausea) এবং বমি এই দুটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (side effect) সাধারণত কেমোথেরাপীর নিত্য সঙ্গী। কিন্তু আশার কথা হল, এইগুলি সহজেই কম করা যায়। খাওয়া দাওয়ার ধরণ এবং সময় একটু অদল বদল করে এবং যথাযথ ওষুধ খেয়ে। বিশেষ করে কয়েকটি ব্যাপারে সচেতন থাকলে কষ্ট কম করা যায়। যেমন -

১) একসঙ্গে অনেকটা করে না খাওয়া এবং বারবার অল্প করে খাওয়া।
২) তরল পদার্থ (যেমন জল) খাওয়ার একঘন্টা আগে বা পরে খাওয়া।
৩) খাবার, জল, সবকিছু তাড়াহুড়ো না করে আস্তে আস্তে খাওয়া।
৪) ভাজাভুজি বা চর্বিযুক্ত খাবার থেকে দূরে থাকা।
৫) খাবার ভালো করে চিবানো।
৬) ঠান্ডা, চিনি ছাড়া পানীয়, ফলের রস, ঝাঁঝ বের করা পানীয় (Cold drinks) খাওয়া।
৭) বায়ুযুক্ত পানীয় (Aerated drinks) খেতে ইচ্ছে হলে ঝাঁঝ বের করে খাওয়া যেতে পারে।
৮) বরফের টুকরো বা পুদিনা লজেন্স মুখে রাখলে আরাম হবে।
৯) যে গন্ধ খারাপ লাগছে তার থেকে দূরে থাকা উচিত।
১০) নিয়মিতভাবে বড়ো শ্বাস নেওয়ার অভ্যেস করলে ভালো লাগবে।
১১) হালকা জামাকাপড় (যা টাইট্ নয়) পরলে আরাম হবে।
১২) মনোযোগ অন্যদিকে দিলে (যেমন বই পড়া, সখের জিনিস করা) সুবিধা হবে।

খ) চুল পড়া (Hair loss) - চুল পড়ে যাওয়া এই চিকিৎসার একটি সাধারণ অঙ্গ তবে সব কেমোথেরাপীর ওষুধেই চুল পড়ে না। অনেকেরই চুল একটু কম হয়ে যায়। যা শুধু নিজেরই নজরে আসে। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে সব চুল পড়ে গেলেও চিকিৎসা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আবার নতুন চুল গজায়। যদিও হয়ত নতুন চুলের ধরণ একটু অন্যরকম হয় বা আগের মত হয়ত সব সময় হয়না। কয়েকটি ব্যাপারে সতর্ক থাকলে চুল পড়া কম হবে যেমন হালকা শ্যাম্পু ব্যাবহার করা, নরম চিরুনি ব্যাবহার করা, হেয়ার ড্রায়ার (Hair Drier) না ব্যাবহার করা, চিকিৎসা চলাকালীন চুলে রং না করা ইত্যাদি। চুল কমতে শুরু করলে একটু ছোট করে কাটলে বেশ বেশী দেখাবে আর একদম কমে গেলে ভালো দেখে একটা পরচুলা (wig) ব্যাবহার করা যায় নতুন চুল না হওয়া পর্যন্ত।

গ) ক্লান্তি এবং অবসন্নতা - সাধারণত ক্লান্তি এবং অবসন্নতাও কেমোথেরাপীর নিত্য সঙ্গী। অল্প অল্প ক্লান্ত হওয়ার থেকে কোন কোন সময় একেবারে শরীর অবশও হয়ে যায়। চিকিৎসার শুরুতে এবং শেষ হবার সময় এই অনুভূতি বেশী হয়। অন্যান্য সাইড্ এফেক্টের মতই কেমোথেরাপী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই ক্লান্ত অবস্থা দূর হয়ে যায়। এই ক্লান্তি এবং অবশতা দূর করবার জন্য যথেষ্ট বিশ্রামের দরকার। রাত্রে ভালো ঘুম হওয়া দরকার এবং মাঝে মাঝে দুপুরবেলা ঘুমিয়ে নিলেও আরাম পাওয়া যাবে। দরকার হলে কাজকর্মের পরিমাণও কমাতে হবে বা কারুর সাহায্য নিতে হবে। এইসব কিছুর সঙ্গে ভারসাম্য রেখে ভালো করে খেতে হবে। প্রচুর জল খেতে হবে এবং ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী (কসরৎ) এক্সারসাইজ করতে হবে।

ঘ) **রোগসংক্রমণ** - বেশীর ভাগ কেমোথেরাপী ওষুধ সোজাসুজি মেরুদন্ডের মজ্জাকে (bone marrow) প্রভাবিত করে (খারাপভাবে) এবং সাদা রক্ত কণিকা উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে এই সাদা রক্তকণিকাগুলি (white blood cells) বোনম্যারো ত তৈরী হয় এবং শরীরের কোনরকম রোগ বা ব্যাকটেরিয়াকে (bacteria) প্রতিহত করে। সুতরাং এই রক্তকণিকার পরিমাণ রক্তে কম হয়ে গেলেই নানারকম রোগ সংক্রমণের (Infection) সম্ভাবনা বেড়ে যায়। শরীরের যে কোন অংশেই রোগ সংক্রমণ (Infection) হতে পারে। সাদা রক্তকণিকার পরিমাণ যদি খুব বেশী কম হয়ে যায় তাহলে ডাক্তার সাময়ীকভাবে কেমোথেরাপী বন্ধ রাখবার নির্দেশ দেন বা ওষুধের মাত্রা কমিয়ে দেন অথবা রক্তে এই রক্তকণিকা বাড়াবার জন্য অন্য বিশেষ চিকিৎসা শুরু করেন।

নিম্নলিখিত উপায় রোগ সংক্রমণকে (infection) আটকানো যায় বা কম করা যায় -

১) হাত সব সময় পরিস্কার রাখতে হবে, বারবার ধুয়ে নিতে হবে।

২) যাদের সর্দ্দি, জ্বর, হাম (measles) বা চিকেন পক্স (chicken pox) হয়েছে তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে, তা নাহলে সহজেই ছোঁয়াচ লেগে যাবে।

৩) ভীড়ের জায়গায় যাওয়া সাময়ীকভাবে বন্ধ করা দরকার।

৪) মল ত্যাগ করবার পর যোনী এবং আশপাশের জায়গা ভালো করে পরিস্কার করতে হবে। কোনরকম অস্বস্তি অনুভব করলে বা অশ্বর (Piles) কষ্ট হয় তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

৫) নোখ কাটার সময় বা নোখের উপরের স্তর কাটার সময়, দাড়ি কামানোর সময়, দাঁত মাজার সময় বা ধারালো ছুরি দিয়ে কোন কাজ করার সময় সচেতন থাকতে হবে যেন কাটা ছেঁড়া না হয়।

৬) কোন ফুসকুড়ি বা ফোঁড়া হলে সেটা একেবারেই নিষ্পেশণ করা বা চাপ দেওয়া ক্ষতিকারক।

৭) কোন কারণে এইসময় যদি ক্ষত হয় তাহলে সময় নষ্ট না করে সেটিকে খুব ভালো করে পরিষ্কার করে ওষুধ (antiseptic) লাগাতে হবে।

৮) যদি চুল পড়ে যায় তাহলে রোদ থেকে বাঁচবার জন্য টুপি পরতে হবে বা স্কার্ফ বাঁধতে হবে।

৯) ডাক্তারের অনুমতি না নিয়ে টিকে বা ওই জাতীয় কোন ইন্‌জেক্‌শন নেওয়া উচিৎ নয়।

১০) খুব বেশী জ্বর (100.5 ডিগ্রির ওপর), ঠান্ডা ঠান্ডা লাগা, বেশী ঘাম হওয়া, পেট খারাপ, মূত্র ত্যাগের সময় জ্বালা করা, কাশী, গলা খারাপ, যোনী থেকে সাদা স্রাব বা চুলকানি, কোনো জায়গা লাল হয়ে যাওয়া বা ফুলে যাওয়া, ক্ষতের চারপাশটা ফুলে গিয়ে ব্যাথা হওয়া বা তলপেটে ব্যাথা হওয়া, এইগুলো রোগ সংক্রমণের লক্ষণ।

"সুষম পুষ্টি এবং যথাযথ পথ্যর সাহায্যে শরীরে সন্তলণ বজায় রাখা দরকার। তাহলেই এই রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করা যাবে।"

ঙ) **দাস্ত (পেট খারাপ) হলে কি করা উচিৎ** - পেটে ব্যাথা এবং দাস্ত যদি ২৪ ঘন্টা একভাবে চলে তাহলে নিশ্চয়ই ডাক্তার দেখাতে হবে। কোনরকম পেটখারাপের ওষুধ ডাক্তারকে না জিজ্ঞেস করে খাওয়া উচিৎ নয়। পেট খারাপের সময় একসঙ্গে কম করে খাওয়া ভালো আর চা, কফি এবং মিষ্টি খাওয়া ঠিক নয়। গুরুপাক খাবার যেমন - বিন্‌স্, বাদাম, ভাজাভুজি, মশলাদার খাবার, দুধের তৈরী খাবারও এই অবস্থায় পেটের পক্ষে ঠিক নয়। এই সময় অনেক জল খাওয়া দরকার এবং পটাশিয়াম প্রধান ফল যেমন - কলা, কমলালেবু, খাওয়া দরকার।

চ) **কোষ্ঠকাঠিন্য হলে কি করা উচিৎ** - কেমোথেরাপীর সময় কিছু লোকের কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। দুদিন পর্য্যন্ত পেট পরিষ্কার না হলে ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে হবে। অনেক জল খেলে অনেকসময় পেট পরিষ্কার হয়ে যায়। এছাড়া ছিবড়েযুক্ত খাবার (High Fiber Food) যেমন আটার রুটি, সিরিয়াল, কাঁচা বা সেদ্ধ তরকারী, ফল, বা ড্রাই ফ্রুট খেলেও সাহায্য হয়। এছাড়া একদম শুয়ে বসে না থেকে অল্প কসরৎ (exercise) করাও ভালো।

ছ) **রক্তের মধ্যে প্ল্যাটিলেটের পরিমাণে ঘাটতি (thrombocytopenia) থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া (সচরাচর কম দেখা যায়)** - কেমোথেরাপী রক্তের দ্রুতগতিতে বেড়ে যাওয়া কোষগুলিকে নষ্ট করে দেয়, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরসঙ্গে মেরুদন্ডের মজ্জাকেও (bone marrow) প্রভাবিত করে কম করে। Bone marrow বা মজ্জার থেকেই প্ল্যাটিলেট সৃষ্টি হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এর উৎপাদন কম হয়। একে

থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া বলা হয়। যদিও এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া লিউকোমিয়া ছাড়া অন্যান্য ক্যানসারগ্রস্তদের ক্ষেত্রে কম দেখা যায়। রক্তের প্ল্যাটিলেট কেটে গেলে, ছেড়ে গেলে, রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে সাহায্য করে। রক্তের মধ্যে যখন প্ল্যাটিলেটের পরিমাণ কম হয়ে যায় (2000ml-এর থেকেও কম) তখন রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়া মুসকিল হয়ে যায় এবং এই অত্যাধিক রক্তক্ষরণে শরীরের ভেতরের অঙ্গ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলে কেমোথেরাপী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হয় না, কারণ ডাক্তারকে ওষুধদ্বারা রক্তে প্ল্যাটিলেটের পরিমাণ বাড়ানোর ব্যাবস্থা করতে হয়। যে সমস্ত হার্টের রুগীদের রক্ত তরল করবার (blood thinner) ওষুধ খেতে হয় তাদের ক্ষেত্রে রক্তক্ষরণ আরো বেড়ে যায়। সমস্ত রুগীদেরই কেমোথেরাপী চলাকালীন কেটে যাওয়া, ছড়ে যাওয়া বা যে কোন কারণে রক্তক্ষরণ যাতে না হয় তারজন্য সতর্ক থাকতে হবে, যেমন -

১) ধারালো রেজারের (Razor) বদলে ইলেকট্রিক রেজার দিয়ে দাড়ি কামানো উচিৎ

২) নরম টুথব্রাশ ব্যাবহার করা উচিৎ

৩) নরম জুতো পরলে ভালো হয় যাতে পা না কেটে যায়

৪) নাক পরিষ্কারের সময় বেশী জোর না দেওয়া উচিৎ

জ) **স্মৃতিশক্তি এবং চিন্তাশক্তির সমস্যা** - কেমোব্রেণ (Chemobrain) কিছু কিছু ক্ষেত্রে (সাধারণত স্তন ক্যানসারগ্রস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে) কেমোথেরাপী চিকিৎসা চলাকালীন এই সমস্যা দেখা যায়। এই সমস্যাকে কেমোব্রেণ (Chemobrain) বলা হয়। চিকিৎসা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে স্মৃতিশক্তি এবং চিন্তাশক্তি স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসে। তবে কিছু কিছু রোগীদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে সময় বেশী লাগে। নিম্নলিখিত উপায় এই সমস্যার মোকাবিলা করলে সুবিধা হবে -

১) কোন কাজ করার সময় মনযোগ সেই কাজেই অক্ষুণ্ণ রাখা
২) রোজকার কাজ লিখে রাখলে ভুলে যাওয়ার থেকে বাঁচা যায়
৩) ফোনে এ্যালার্ম দিয়ে রাখলে মনে রাখতে সাহায্য হবে
৪) ভালো করে পুরো ঘুমোনো উচিৎ
৫) পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুবান্ধবকে এই সমস্যার কথা জানিয়ে রাখা উচিৎ যাতে তারা দরকার মত সাহায্য করতে পারে।

ঝ) **অবশতা এবং ঝনঝন করা (Numbness and Tingling)** - পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি (Peripheral Neuropathy) - এই অবশতা এবং ঝনঝনভাব সাধারণত হাত, পা, হাতের এবং পায়ের আঙুলকে প্রভাবিত করে। আঙুল থেকে শুরু হয়ে হাত এবং পা পর্য্যন্ত এই অনুভব পৌঁছায়। এই সমস্যাকে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি (Peripheral Neuropathy) বলা হয়। এই সমস্য কিছু বিশেষ ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। এই ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্নায়ু বা নার্ভকে প্রভাবিত করে স্নায়ুকেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং প্রভাবিত করে। অবশতা ছাড়াও এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াতে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ ব্যাথা, জ্বলা, পেশীর দুর্বলতা প্রভাবিত জায়গার অনুভূতিহীনতা (যেমন - ঠান্ডা, গরম, চাপের অনুভূতি) ব্যালেন্স হারানো। চিকিৎসার সাহায্যে (ওষুধ দ্বারা বা ফিজিওথেরাপী দ্বারা) এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার প্রভাব সংযত করা হয়। সম্পূর্ণ সুস্থতা এই ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম হারে হয়। কিছু ক্ষেত্রে সময় বেশী লাগে। নিম্নলিখিত ব্যাপারে সচেতন থাকলে সাহায্য হয় -

১) ডায়েবিটিক্ রুগীদের সুগার যাতে না বাড়ে সেটার প্রতি লক্ষ্য
২) অকুপাংচার (Acupuncture) - এই চিকিৎসা কিছু রুগীকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। ডাক্তারের কাছে এই ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে
৩) মালিশ করলে শরীরের রক্ত সঞ্চালণ বেড়ে যায়
৪) কসরৎ বা exercise এই স্নায়ুর ব্যাথাকে সাহায্য করে
৫) কিছু বিশেষ ওষুধ সাহায্য করে
৬) ট্রান্সকিউটেনাস্ নার্ভ স্টিমুলেশন্ (Transcutaneous nerve stimulation TENS) প্রভাবিত জায়গায় ইলেকট্রিক কারেন্ট পাস করিয়ে স্নায়ুকে পুর্ণজিবিত করা যায়

ঞ) **যৌন ইচ্ছা এবং উর্ব্বরতা** - কেমোথেরাপীর সময় অনেক সময় এই ব্যাপারে অসুবিধা হয়। পুরুষদের অনেকসময় অন্ডকোষ কম হয়ে যায় ফলে উর্ব্বরতা প্রভাবিত হয়। তবে যৌন সঙ্গমে অসুবিধা হয় না। মহিলাদের এইসময় অনেকরকম অসুবিধা হয়। ওভারিতে যদি ক্ষতি হয় তাহলে শরীরের হরমোন কম হয়ে যায়। মাসিক অনিয়মিত হয় এবং উর্ব্বরতা কম হয়। কমবয়সী মহিলাদের এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সাময়ীক তবে ৪৫ বয়সোর্দ্ধ মহিলাদের মেনোপেজ হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশী। কেমোথেরাপী চলাকালীন (মা বা বাবার) অন্তঃস্বত্তা না হওয়াই উচিৎ। জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যাবস্থা নেওয়া জরুরী। ভবিষ্যৎ ভেবে পুরুষরা সিমন্ (Semen) সংরক্ষণের ব্যাপারে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

ট) **মনের আবেগের উপর প্রভাব (Emotional Problem)** - কেমোথেরাপী জীবনে একটা বড়রকম পরিবর্তন আনে সাময়ীকভাবে। তার কারণ এই সময় শরীর ঠিক থাকে না। স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়, মাঝে মাঝে সম্পর্কের মধ্যেও অসুবিধা তৈরী করে। এটা স্বাভাবিক যে পরিবারের সবাই এই ব্যাপারে চিন্তান্বিত থাকে। এই অবস্থায় রাগ হওয়া, দুঃখ হওয়া, ভুল বোঝাবুঝির সমস্যা দেখা যায়। এক অপরের সঙ্গে কি রকম ব্যাবহার করবে বুঝতে পারে না। এই সময় কারুর কাছে মন খুলে কথা বললে (রোগী এবং পরিবারের সদস্য) কোন বন্ধু বা আপনজনের কাছে মানসীকভাবে নির্ভর করলে অনেক সাহায্য হয়।

এছাড়া নিজেকে অন্যমনস্ক রাখবার জন্য কোন বিশেষ সখের (Hobby) দিকে মন দিলে বা প্রত্যক্ষবাদী (Positive) মনভাব থাকলে নিশ্চয়ই এর থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

৮। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে কি ধরণের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার -

- ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করবার নির্ধারিত সময়ের আগে সমস্ত সমস্যা এবং প্রশ্ন লিখে নিলে সুবিধা হবে। এই লিস্টটা চালু রাখলে বোঝাযাবে কি প্রশ্ন আগে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। দুটো প্রশ্নের মাঝখানে একটু জায়গা রাখলে উত্তরটাও লিখে নেওয়া যাবে।
- ডাক্তারের কাছে যাবার সময় একজন বন্ধু বা পরিবারের কাউকে সঙ্গে রাখা দরকার। ডাক্তার বা নার্স কি বললেন সেটা অনেক সময় বোঝা যায় না তাই অরেকজন থাকলে বোঝবার সুবিধা হবে।
- সমস্ত রকম প্রশ্নই ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে কিছুই কম মহত্বপূর্ণ নয়।
- ডাক্তার যা বলছেন সেটা লিখে রাখা দরকার। রেকর্ডও করে নেওয়া যেতে পারে।
- কিছু লিখিত বই বা লিফলেট পেলে এই সময় সুবিধা হয়।
- কতটা তথ্য জানতে চান সেটা ডাক্তারকে জানিয়ে দিলে ভালো। কেউ অনেক বেশী তথ্য জানতে চায়। কেউ আবার অল্পতেই খুশী। একটা কথা মনে রাখা উচিৎ বেশী তথ্য জানবার ইচ্ছায় না বুঝতে পারায় অনেক সময় মানসীক পীড়ন হয়, সুতরাং যতটা বুঝতে পারা যাবে ততটাই জানা উচিত। ডাক্তারের ওপর পুরো ভরসা রাখা উচিত।
- ডাক্তারকে, হাসপাতালকে কিভাবে যোগাযোগ করা যাবে, যদি হঠাৎ দরকার হয় সেইসব তথ্য নম্বর লিখে রাখা দরকার।

"চিকিৎসা চলাকালীন মানসীক আবেগ এবং মানসীক পীড়ন তখনই হেরে যাবে যখন শরীর এবং মন একসঙ্গে যুঝতে পারবে।"

কৃতজ্ঞতা স্বীকার -
ডাঃ ভাবনা পারিখ, এম.ডি
কনসালটেন্ট মেডিকাল অঙ্কোলজিস্ট
বম্বে হসপিটাল, নানাভতি হসপিটাল এবং হোলি ফ্যামিলি হসপিটাল

SARASWATI OFFSET : 4971 6983

1969
2019
CPAA

Cancer Patients Aid Association

Total Management of Cancer

www.cancer.org.in

Anand Niketan, King George V. Memorial, Dr. E. Moses Road,
Mahalakshmi, Mumbai, MH, India - 400 011
Tel : +91 22 2492 4000 / Fax : +91 22 2497 3599
e-mail : webmaster@cancer.org.in • website : www.cancer.org.in